যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার

প্রকল্প জালিয়াতি

লিখেছেন **সুমিত হক**

দেশের অবকাঠামো খাতে দুর্নীতি-অনিয়মে যেন নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ফ্লাইওভার। একাধিক অনিয়ম ও অসম্পন্নতার মধ্য দিয়ে চালু হওয়া মহাখালী ও খিলগাঁও ফ্লাইওভারের পর এবার এ ধারায় যুক্ত হচ্ছে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার। মূল পরিকল্পনা পরিবর্তন করে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিশেষ ছাড়ে বিশেষ কোম্পানিকে কাজ দেয়ায় শুরুতেই প্রশ্নবোধক হয়ে উঠেছে প্রকল্পটি।

বিকৃত সমীক্ষা প্রতিবেদন

মূলত বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার প্রকল্পটির কাজ অনুমোদন করেছে সরকার। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে যানজট নিরসনের জন্য সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করার কথা বলা হয়। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা নগর পরিবহন প্রকল্পের আওতায় ডিইউটিপির পরামর্শক টনি ওবদেমের নেতৃত্বে একটি দল সমীক্ষায় ২০০০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর 'যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার সমীক্ষা রিপোর্ট' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন বৃহত্তর ঢাকা পরিবহন পরিকল্পনা ও সমন্বয় বোর্ডের তৎকালীন অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক এএমজি মাহমুদ চৌধুরীর কাছে জমা দেন। এ প্রতিবেদনে যাত্রাবাড়ী থেকে সায়েদাবাদ রেলক্রসিং পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য নকশাসহ এ এলাকার অবকাঠামোগত অবস্থা অর্থনৈতিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। এতে প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারের মূল দৈর্ঘ্য ১.৮ কিলোমিটারসহ মোট দৈর্ঘ্য ধরা হয় সাড়ে তিন কিলোমিটার।

দীর্ঘ চার বছর পর গত ৯ মার্চ মন্ত্রিসভা কমিটি যখন ফ্লাইওভারের প্রকল্প। প্রস্তাব অনুমোদন করল, তখন দেখা গেল এটি হয়েছে 'যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার প্রকল্প' যেখানে ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ৭.৫ কিলোমিটার এবং বিস্তৃতি সায়েদাবাদ রেলক্রসিংয়ের পরিবর্তে গুলিস্তান পর্যন্ত। ফ্লাইওভার দীর্ঘ হলে কোনো ক্ষতি নেই যদি তা যথাযথ সমীক্ষাভিত্তিক হয়ে থাকে। অভিযোগ উঠেছে, সায়েদাবাদ রেলক্রসিং থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ফ্লাইওভারটির যে বিস্তৃতি তা কোনো সমীক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে। অন্তত বিশ্বব্যাংক কোনো সমীক্ষা চালায়নি।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, 'বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার নির্মাণের সমীক্ষার জন্য, যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভারের জন্য নয়। এজন্য বিশ্বব্যাংক কোনো আর্থিক সহায়তা দেয়নি।'

তার মানে হলো, বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদন বিকৃত করা হয়েছে এবং বিকৃত প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ সভায় ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আশিকুর রহমান অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদন রিপোর্ট বিকৃত করার অভিযোগ সত্য নয়। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত সমীক্ষা প্রতিবেদনটি সময়োপযোগী করার জন্য পরবর্তীতে সিঙ্গাপুরের একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। যথাযথ নিয়মনীতি ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।'

অথচ প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী বিওটি (নির্মাণ, পরিচালন ও হস্তান্তর) পদ্ধতিতে এ ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য যেসব আন্তর্জাতিক কোম্পানি টেন্ডারে অংশ নিয়েছে তাদের কাছেও সরবরাহ করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের বিকৃত সমীক্ষা রিপোর্ট। আবার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত সারসংক্ষেপেও শুধু বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা রিপোর্টের কথা উলেখ করা হয়েছে, সিঙ্গাপুরের ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষার কথা বলা হয়নি।

এ ব্যাপারে টেলিফোনে আলাপকালে নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি বেলহাসা গ্রুপের স্থানীয় এজেন্ট ওরিয়ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওবায়দুল করিম বলেন, 'টেন্ডার ডক্যুমেন্ট হিসেবে আমাদের কাছে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনই দেয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই আমরা টেন্ডারে অংশ নিয়েছি, প্রতিবেদনটি আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।' সিঙ্গাপুরের কোনো প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ে তিনি কিছু জানেন বলেও মন্তব্য করেন।

প্রকল্প ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি

ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য টেন্ডারে অংশ নেয়া কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবনা মূল্যায়ন ও কারিগরি বিষয় পর্যালোচনার জন্য ভারতের পরামর্শক অতুল ভবেকে নিয়োগ দেয়া হয়। পরামর্শক অতুল ভবের দেয়া প্রতিবেদনে মোট নির্মাণ ব্যয় ৩৬৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিবেদনের নবম পৃষ্ঠায় এ ব্যয়ের চিত্র ও এর সাপেক্ষে প্রাক্কলিত টোলও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে নির্ধারিত ব্যয়ের অংশে ৩৬৭ কোটির স্থলে ৫৬৭ কোটি টাকা দেখিয়ে পরিবর্তিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর অতুল ভবের প্রতিবেদন ২০০৩ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রহণ করলেও মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে উপস্থাপিত সারসংক্ষেপে প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ২০০৩ সালের ২৭ নবেম্বর দেখানো হয়েছে। আবার ২০০৩ সালের ২৭ নবেম্বর দাখিলকৃত প্রতিবেদন টেন্ডার কমিটি ২০০৩ সালের ৮ নবেম্বর মূল্যায়ন করেছে বলে সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে

পরামর্শক অতুল ভবের দেয়া প্রতিবেদনে মোট নির্মাণ ব্যয় ৩৬৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিবেদনের নবম পৃষ্ঠায় এ ব্যয়ের চিত্র ও এর সাপেক্ষে প্রাক্কলিত টোলও নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে নির্ধারিত ব্যয়ের অংশে ৩৬৭ কোটির স্থলে ৫৬৭ কোটি টাকা দেখিয়ে পরিবর্তিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়

এখানে বড় ধরনের অনিয়মই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি প্রথম এ ফ্লাইওভারের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয় অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে। বৈঠকে কমিটি ৫৫০ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যয় অনুমোদনের প্রস্তাব করতে চাইলে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী নিজেই আপত্তি করেন এবং পরামর্শকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩৭০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় নির্ধারণের পর পুনরায় পরের বৈঠকে উপস্থাপনের নির্দেশ দেন। ওই দিনের বৈঠকের সিদ্ধান্তপত্রে দেখা যায়, ৯টি পয়েন্টে এ ফ্লাইওভার নির্মাণের নানা বিষয় নিয়ে আপত্তি করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র দু'মাসের মাথায় ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে ব্যয় অনুমোদন করা হয় তার পরিমাণ প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। মানে ব্যয় তো কমানো হয়ইনি বরং তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে পুরো প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অর্থমন্ত্রী বিন্দুমাত্র আপত্তি করেননি, এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা আগের বৈঠকে যেসব আপত্তি করেছিলেন সেগুলোও উত্থাপন করেননি। সেদিনের বৈঠকে সে বিষয়েও কোনো আপত্তি করেননি। বৈঠক সূত্র জানায়, এ এজেন্ডা বৈঠকে ওঠার মাত্র তিন মিনিটের মাথায় অনুমোদন লাভ হয়। ৯ মার্চের বৈঠকে অর্থমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রী কেন নিশ্চুপ ছিলেন তা নিয়েও রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিটি কর্পোরেশনে টেন্ডার খোলার সময় যে বিবরণী লেখা হয়, সেখানেও এ ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য বেলহাসা কোম্পানির প্রস্তাবিত ব্যয় ৩৬৭ কোটি টাকা দেখানো হয়।

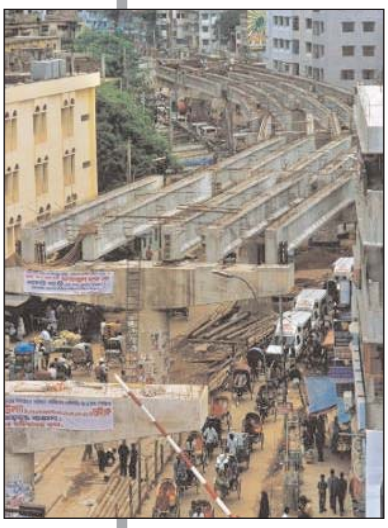

একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণ ব্যয় ধরে হিসাব করলে প্রতি কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য ব্যয় ৪০ কোটি টাকা। এ হিসাবে ৭ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত ২৮০ কোটি টাকা। কিন্তু যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয় অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে।

অবশ্য নির্মাণ ব্যয় প্রসঙ্গে ওরিয়ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাংবাদিকদের বলেন, 'নির্মাণ ব্যয় সম্পূর্ণ কোম্পানির। এর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা আমরা অর্থ যোগানদাতা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছি। বাকি টাকা কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে দেয়া হবে।' তিনি প্রথমে ৩৬৭ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণের বিষয়টি সঠিক নয় বলে জানান। প্রকল্প পরিচালক আশিকুর রহমানও তার দপ্তর থেকে তথ্য ও সমীক্ষা বিকৃতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'অতুল ভবের যে প্রতিবেদনের কথা বলা হচ্ছে সেটি ভুয়া। কোনো স্বার্থান্বেষী মহল এটি তৈরি করে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

২০০৩ সালের ১৪ অক্টোবর অতুল ভবের দেয়া প্রতিবেদন গ্রহণ করেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের সিলমোহর দেয়া ও কনফিডেন্সিয়াল লেখা এ প্রতিবেদনে টেন্ডার কমিটি কর্তৃক রেসপনসিভ ঘোষিত তিনটি কোম্পানির প্রস্তাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনের ৭ম পাতায় এ কাজের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কোম্পানি বেলহাসার দরপত্রের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে, ৯ম পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে কোম্পানির দেয়া খরচের পরিমাণ এবং টোল আদায়ের হার। এতে দেখা যায়, খোদ বেলহাসা কোম্পানিই ৩ হাজার ৬৭৪ দশমিক ১ মিলিয়ন টাকা (৩৬৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা) মোট নির্মাণ খরচ ও টোল আদায়ের জন্য ২২ বছর সময়ের কথা উলেখ করেছে। তার মানে, বেসরকারি নির্মাণ কোম্পানি মোট নির্মাণ খরচের যে পরিমাণ উল্লেখ করেছে, তারচেয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের তৈরি করা প্রস্তাবে ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। আবার চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণীতে বেলহাসার প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয় ৫৬৭ কোটি ৪ লাখ টাকা উলেখ করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়েছে সব নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে।

উচ্চহারে টোল, যথেচ্ছ সুবিধা

৭০০ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যয় দেখিয়ে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা টোল আদায়ের ব্যবস্থা আগেই পাকাপোক্ত করে ফেলেছে প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি কোম্পানি। গত ৯ মার্চ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হার অনুযায়ী প্রতিবার ফ্লাইওভার ব্যবহারের

চারটি ফ্লাইওভার

দেশের অর্থে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মিত খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে বিদেশী অর্থায়নে বিদেশী পরামর্শকদের তত্ত্বাবধানে মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যয় হয় ১২৩ কোটি টাকা। অথচ খিলগাঁও ফ্লাইওভার মহাখালী ফ্লাইওভারের প্রায় দ্বিগুণেরও বড়। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৯০০ মিটার, প্রস্থ ১৪ মিটার, স্প্যান সংখ্যা ৪৫। অন্যদিকে মহাখালী ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য মাত্র ৬৮৬ দশমিক ৯৮ মিটার, প্রস্থ ১৭ মিটার, স্প্যান সংখ্যা ১৯টি। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে ৬০ টন পর্যন্ত ওজনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে, কিন্তু মহাখালী ফ্লাইওভারে এখন পর্যন্ত ৫ টন ওজনের ট্রাক উঠতে দেয়া হচ্ছে না ধারণক্ষমতা নিয়ে আশঙ্কার কারণে। খিলগাঁও ফ্লাইওভার ভূমিকম্প প্রতিরোধের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে উদ্বোধন করা হয়। আর মহাখালী ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হয় ভূমিকম্প প্রতিরোধক ২১টি শক ট্রান্সমিট ইউনিট না বসিয়েই। এগুলো এখনো লাগানো হয়নি। অথচ খিলগাঁও ফ্লাইওভারের তুলনায় মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে ৪২ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণের ক্ষেত্রে মোট ১৩ বার মূল নকশা পরিবর্তনসহ ৭৩ বার এটি সংশোধন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি প্রভাবশালী মহলের নানা আব্দারের কারণেই এ নকশা বারবার সংশোধন করা হয়। ওই প্রভাবশালী মহলের ঘনিষ্ঠজনের পরিচালনায় একটি অবৈধ কাঁচাবাজার রক্ষার জন্যই ফ্লাইওভার থেকে খিলগাঁও অংশের লুপ বাদ দেয়া হয়েছে বলেও সূত্র জানায়। খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে আর্থিক অনিয়ম তেমন হয়নি, হয়েছে নকশা তৈরির ক্ষেত্রে।

এদিকে মগবাজার-মৌচাক এলাকায়ও ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। এর প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০০ কেটি টাকা। প্রকল্পটি আগামী অর্থবছরে অনুমোদন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। দাতা দেশগুলোর সহায়তা ও সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এ ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে বলেও সূত্র জানায়।

পণ্য ট্রেইলার ২০০ টাকা, ট্রাক ও বাস ১৫০ টাকা, মিনিবাস ১০০, মিনি ট্রাক (৪ চাকা) ১০০ টাকা, মাইক্রোবাস ৫০ টাকা, জিপ ৪০ টাকা, প্রাইভেট কার ৩৫ টাকা, অটোরিকশা ১০ টাকা এবং ২ চাকার যান্ত্রিক যানবাহনকে ৫ টাকা হারে টোল দিতে হবে। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ডের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাত্রাবাড়ী এলাকা দিয়ে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৮৭ হাজার যানবাহন চলাচল করে। তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি জানিয়েছে, ভবিষ্যতে যানবাহন চলাচল কমে যাবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বর্তমানের তুলনায় ৬৬ শতাংশ যানবাহন চলাচলের কথা তুলে ধরে জানানো হয়েছে, কোম্পানি টোল আদায় করবে ২৪ বছর। তবে যানবাহন সংখ্যা আরো কমে গেলে এ সময়সীমা এবং টোল রেট বাড়ানো যাবে। বর্তমানের তুলনায় ৬৬ শতাংশ যানবাহন চললে এবং কোম্পানির হিসাবে গড়ে ৮৩ টাকা হারে প্রতি যানবাহন থেকে টোল আদায় করা হলে ২৪ বছরে মোট টোল আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। তাছাড়া টোল আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতুর মতো যানবাহন সংখ্যা নির্ধারণের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রাখার কোনো শর্ত নেই। ফলে কোম্পানি ইচ্ছেমতো যানবাহন চলাচলের হিসাব দেখাতে পারবে। আবার কোম্পানির হাতে সময়সীমা এবং টোল রেট বাড়ানোর পূর্ণ সুযোগ থাকছে। এর সঙ্গে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়ি থেকেও টোল আদায়ের শর্ত যুক্ত হওয়ার ফলে নানা মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অবশ্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা সংবাদ সম্মেলন করে ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য টোল আদায় না করার ঘোষণা দিয়েছেন। চড়া হারে টোল আদায়কে যুক্তিযুক্ত করার জন্যই যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নির্মাণ ব্যয় বাড়ানো হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

নির্মাণ কাজের শর্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানিকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাত ছাড়া আর কোনো খাতে কাজের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া হয় না। এই প্রথম যোগাযোগ খাতে এ ধরনের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো সার সংক্ষেপেও (সিদ্ধান্ত অংশ, 'গ') এই শুল্কমুক্ত সুবিধাকে সরকারের করনীতির পরিপন্থী বলে উলেখ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্তের 'ঘ' অংশে বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেয়ার প্রস্তাবকেও বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে উল্লেখ করা হয়।

নেপথ্যে কারা?

যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের ব্যয় অনুমোদনের পর থেকে নগর ভবনে একটি মুখরোচক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারের এক ক্ষমতাধর ব্যক্তি এক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের একটি শহরে বসে প্রায় ২০০ কোটি টাকা উপহার পেয়েছেন। এই উপহারের কারণেই তিনি অন্যদেরও ম্যানেজ করে বর্তমানে কাজ পাওয়া কোম্পানিকে অতিরিক্ত ব্যয়ে কাজ দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। বলা হচ্ছে, ক্ষমতাধর ওই ব্যক্তি অন্য এক ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অচিরেই একটি টিভি চ্যানেলের মালিক হতে যাচ্ছেন, যার অর্থের যোগান আসছে ওই উপহারের অর্থ থেকে।